দুর্দিনের যাত্রী

BanglarBlog

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল

এস ভাই, পথের সাথী বন্ধুরা আমার, এস আমাদের লক্ষ্মীছাড়ার দল ! আজ শনি এসেছে তোমাদের পোড়া-কপালে বাসি ছাই-এর পাণ্ডুর টিকা পরিয়ে দিতে। এস আমার লক্ষ্মীছাড়া গৃহহারা ভাইরা ! আজ ঝর-ঝর বারিধারার সুরে সুরে কান্না উঠেছে—'হায় গৃহহীন, হায় পথবাসী, হায় গতিহারা !' এই 'আকাশ-ভাঙা আকুল ধারার' মাঝে নাঙ্গা শিরে আদুল গায়ে বেরিয়ে এস—বেরিয়ে এস আমার পথের সাথীরা। তোমাদের জন্যে গৃহ নাই, তোমাদের জন্যে দয়া নাই, করুণা নাই, এই দুর্দিনে তোমাদের ঘরে ডেকে নেবার কেউ নেই, তোমাদের ডাক দিয়েছে ঐ ঝড়-বাদলের উতল হাওয়া আর মাটির মায়ের সিক্ত কোল। তোমাদের জন্য কোনো গৃহের বাতায়নে কালো চোখের করুণ কামনা ঝিলিক মারে না, তোমাদের অভাবে এ দুর্দিনে কারুর মন্দিরে শূন্যতার ধ্বনি বাজে না, তোমাদের কারুর হৃদয় পীড়িত হয়ে ওঠে না। এস আমার অনাদৃত লাঞ্ছিত ভাইরা, আমরাই নতুন করে আমাদের জ্বালার জগৎ সৃষ্টি করব ! শনি হবে আমাদের কপালে জয়টিকা, 'ধূমকেতু' হবে আমাদের রথ, মরুভূমি হবে আমাদের মাতৃক্রোড়, মৃত্যু হবে আমাদের বধূ। এস—এস আমার লক্ষ্মীছাড়ার দল ! ত্যক্ত শতমুখী আমাদের বিজয়কেতন, মড়ার মাথা আমাদের রক্ত দেউল-দ্বারে মঙ্গল-ঘট, গরল আমাদের তৃষ্ণার জল, দাবানল-শিখা আমাদের মলয়-বাতাস, নিদাঘ-আতপ আমাদের তৃপ্তি, জাহান্নাম আমাদের শান্তি-নিকেতন। এস আমার শনির শাপদৃপ্ত ভাইরা ! আমরা জয়নাদ করব অমঙ্গল আর অভিশাপের। সদ্য পুত্রহীনা জননী আর স্বামীহারা সদ্য বিধবার সৃষ্টি-কাঁদানো ক্রন্দন আমাদের মাধবী-উৎসবের গান, মৃত্যু-কাতর মুখের যন্ত্রণা আমাদের হাসি, আর ঐ যে ঘরে-ঘরে মায়ের মমতা, বোনের স্নেহ, প্রেয়সীর ভালোবাসা—ঐ আমাদের চোখের জল। ঐ যে গৃহের শান্তি, তৃপ্তি, আনন্দ, ঐ আমাদের কান্না। ঐ তরুণ কালো চোখের দীপ্তি আমাদের শিকল, ঐ শূন্য হিয়ার ব্যথিত কামনা আমাদের কারাগার। ঐ শ্মশান-মশান-চারিণী চণ্ডী আমাদের বীণবাদিনী। মহামারি, মারিভয়, ধ্বংস আমাদের উল্লাস। রক্ত আমাদের তিলক, রৌদ্র আমাদের করুণা। এরই মাঝে আমাদের নবসৃষ্টির অভিনব তপস্যা শুরু হবে। এস আমার সূর্যতাপস তরুণের দল। সান্ধ্য-শ্মশান আর গোরস্থান আমাদের সান্ধ্য-সম্মিলনী, আলেয়া আমাদের সান্ধ্যপ্রদীপ, মড়া-কান্না আর পেচক-শিবাদি-রব আমাদের মঙ্গল হুলুধ্বনি। মরীচিকা আমাদের লক্ষ্য, আঘাত আমাদের আদর, মার আমাদের সোহাগ। সর্বনাশ আমাদের স্নেহ, বজ্র-মার আমাদের আলিঙ্গন। উল্কা আমাদের মালা-খসা ফুল, সাইক্লোন আমাদের প্রিয়ার এলোকেশ। সূর্যকুণ্ড আমাদের স্নানাগার, অনন্ত নরক-কুণ্ড।

www.banglarblog.com

এই অমঙ্গল অভিশাপ আর শনির জ্বালানো রুদ্র-চুল্লির মধ্যে বসে তোমাদের নবসৃষ্টির সাধনা করতে হবে। তোমাদের এই রুদ্র তপস্যার প্রভাবে সকল নরকাগ্নি ফুল হয়ে ফুটে উঠবে, যেমন 'ইবরাহীমের' পরশে 'নমরুদের' জ্বাহান্নাম ফুল হয়ে হেসে উঠেছিল। এস আমার অভিনব তরুণ তপস্বীর দল! তোমাদের ধ্বংসের আহ্বান করছি। এস।

তুবড়ি বাঁশির ডাক

ঐ শোনো—

'পুব সাগরের পার হতে কোন্ এল পরবাসী।
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন
হাওয়ায় হাওয়ায় শন্‌শন্
সাপ খেলাবার বাঁশি।'

বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস বিবর থেকে অগ্নি-বরণ নাগ-নাগিনী তোমার নিযুত ফণা দুলিয়ে। ঐ শোন্ সাপুড়ের তুব্‌ড়ি বাঁশির ডাক 'ঘন্ ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় শন্‌শন্ শন্‌শন্'! এস আমার বিষধর কাল-কেউটের দল! তোমাদের বিবর ছেড়ে বেরিয়ে এস এই দিনের রৌদ্র সিন্ধু-কূলে। তটিনী-তীরের কেতকী কুসুমে কুসুমে জড়িয়ে আছে যারা, কেয়ামূলের গোপন তলে আত্মগোপন করে আছে যারা, সেই নাগ-নাগিনীদের মনসার পূজা-বেদী হতে আজ ডাক এসেছে। ঐ শোনো তাঁর দূত বাজায় 'ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় শন্‌শন্ শন্‌শন্।' তোমাদের আদিমাতা অগ্নিনাগিনী আজ গগনতলে বেরিয়ে এসেছে তার পুচ্ছে কোটি কোটি নাগ-শিশু খেলা করছে, ঐ শোনো তার ডাক ঘনঘন শন্‌শন্। ঐ শোনো সাপুড়ের গভীর গুরুগুরু ডম্বরু-রব। তারই রবে বিপুল উল্লাসে পুচ্ছ সাপটি' উঠেছে দিকে দিকে নাগপুরে নাগ-নাগিনী, অধীর আবেগে বাসুকীর ফণা দুলে দুলে উঠছে—বিসুবিয়াসের বিপুল রন্ধ্র দিয়ে তার নাসার বিষ-ফুৎকার শুরু হয়েছে। বেরিয়ে এস—বেরিয়ে এস; বিবরের অন্ধকার হতে এই রৌদ্রদগ্ধ তপ্ত দিবালোকে হে আমার বিষধর কাল-ফণীর দল। তোমাদের বিষ-দাঁতের ছোবলে ছোবলে ধরণী জর্জরিত হয়ে উঠুক, তোমাদের অত্যুগ্র নিশ্বাসে নিশ্বাসে আকাশ তাম্রবর্ণ হয়ে উঠুক, বাতাসে বাতাসে জ্বালাদগ্ধ অগ্নি-দাহন হু-হু-হু-হু করে ছুটে যাক, তোমাদের কর্কশ পুচ্ছে জড়িয়ে বসুমতীর টুঁটি টিপে ধরো। তোমাদের বিষ-জরজর পুচ্ছকে চাবুক করে হানো—মারো এই মরা নিখিলবাসীর বুকে মুখে। বিষের রক্ত-জ্বালায় তারা মোচড় খেয়ে খেয়ে একবার শেষ আর্তনাদ করে উঠুক। খসে খসে পড়ুক তাদের রক্ত-মাংস-অস্থি তোমাদের বিষ-তিক্ত চাবুকের আঘাতে আঘাতে। গর্জন করো, গর্জন করো আমার হলাহলশিখ

www.banglarblog.com

ভুজগ শিশুর দল ! বিপুল রোষে তোমরা একবার ফণা তুলে তোমাদের পুচ্ছের উপর ভর করে দাঁড়াও, বিশ্ব ছড়ায়ে উঠুক শুধু তোমাদের নিযুত কাল-ফণা। আকাশে-বাতাসে দুলুক শুধু তোমাদের নাগ-হিন্দোল। পাতালপুরের নিদ্রিত অগ্নিসিন্ধুতে ফুঁ দাও, ফুঁ দাও—ফুঁ দিয়ে জ্বালাও তাকে। আসুক নিখিল অগ্নিগিরির বিশ্ব-ধ্বংসী অগ্নিস্রাব, ভস্মস্তূপে পরিণত হোক এ-অরাজক বিশ্ব। ভগবান তার ভুল শোধরাক। এ খেয়ালের সৃষ্টিকে, অত্যাচারকে ধ্বংস করতে তোমাদের কোটি ফণা আস্ফালন করে ভগবানের সিংহাসন ঘিরে ফেলুক। জ্বালা দিয়ে জ্বালাও জ্বালাময় বিধি ও নিয়মকে।

এস আমার অগ্নি-নাগ-নাগিনীর দল ! তোমাদের পলক-হারা রক্ত-চাওয়ার জাদুতে হিংস্র পশুর রক্ত হিম করে ফেলি, তোমাদের বিপুল নিশ্বাসের ভীম আকর্ষণে টেনে আনো ঐ পশুগুলোকে আমাদের অগ্নি-অজগরের বিপুল মুখগহ্বরে। আকাশে ছড়াও হলাহল-জ্বালা, নীল আকাশ পাংশু হয়ে উঠুক ! রবি-শশী-তারা গ্রহ-উপগ্রহ সব বিষ-দাহনে নিবিড় কাল হয়ে উঠুক, বাতাস খুন-খারাবির রঙে রেঙে উঠুক। বিদ্যুতে-বিদ্যুতে তোমাদের অগ্নি-জিহ্বা লকলক করে নেচে উঠুক। ঢালো তোমাদের সঞ্চিত বিষ ঐ মহাসিন্ধু, নদনদীর বারি-রাশির মাঝে—টগবগ করে ফুটে উঠুক এই বিপুল জলরাশি—আর তার বুকে তোমাদের বিষ-বিন্দু বুদ্বুদ হয়ে ভেসে বেড়াক।

আজ 'ভাসান'-উৎসবের দিন। মনসার পূজা-বেদীতে তোমাদের সঞ্চিত বিষ উদগীরণের আহ্বান এসেছে। এস—এই ধূমকেতু-পুচ্ছের অযুত অগ্নি-নাগ-নাগিনীর মাঝে কে কোথায় আছ কোন্ বিবরের অন্ধকারে লুকিয়ে হে আমার পরম প্রিয় বিষধর কালফণীর দল ! এই অগ্নিনাগ-বাসে তোমাদেরও বিষ-চক্র-লাঞ্ছিত ফণা এসে মিলিত হোক, তোমাদের বিষ-নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ধূমকেতু-ধুম আরো—আরো ধূমায়িত হয়ে উঠুক।

'ঐ শোনো—শোনো
ঘন ঘন শন্ শন্
সাপ খেলাবার বাঁশি।'

মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা

একবার শির উঁচু করে বল দেখি বীর, 'মোরা সবাই স্বাধীন, সবাই রাজা !' দেখবে অমনি তোমার পূর্ব-পুরুষের রক্ত-মজ্জা-অস্থি দিয়ে-গড়া রক্ত-দেউল তাসের ঘরের মতো টুটে পড়েছে, তোমার চোখের সাত-পুরু-করে বাঁধা পর্দা খুলে গেছে, তিমির রাত্রি দিক-চক্রবালের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে। তোমার হাতে-পায়ে গর্দানে বাঁধা শিকলে

www.banglarblog.com

প্রচণ্ড মোচড় দিয়ে বলো দেখি বীর—'মোরা সবাই স্বাধীন, সবাই রাজা !' দেখবে অমনি তোমার সকল শিকল সকল বাঁধন টুটে খানখান হয়ে গেছে।

স্বরাজ মানে কি? স্বরাজ মানে, নিজেই রাজা বা সবাই রাজা ; আমি কারুর অধীন নই, আমরা কারুর সিংহাসন বা পতাকাতলে আসীন নই। এই বাণী যদি বুক ফুলিয়ে কোনো ভয়কে পরোয়া না করে মুক্ত কণ্ঠে বলতে পার, তবেই তোমরা স্বরাজ লাভ করবে, স্বাধীন হবে, নিজেকে নিজের রাজা করতে পারবে ; নইলে নয়।

কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, এই 'আমার রাজা আমি'—বাণী বলবার সাহস আছে কোন্ বিদ্রোহীর? তার সোজা উত্তর—যে বীর কারুর অধীন নয়, বাইরে-ভিতরে যে কারুর দাস নয়, সম্পূর্ণ উদার মুক্ত ! যার এমন কোনো গুরু বা বিধাতা নেই যাকে ভয় বা ভক্তি করে সে নিজের সত্যকে ফাঁকি দেয়, শুধু সে-ই সত্য স্বাধীন, মুক্ত স্বাধীন। এই অহম্-জ্ঞান আত্মজ্ঞান—অহঙ্কার নয়, এ হচ্ছে আপনার ওপর অটল বিরাট বিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাস না থাকলে মানুষ কাপুরুষ হয়ে যায়, ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়। পরকে ভক্তি ক'রে বিশ্বাস করে শিক্ষা হয় পরাবলম্বন, আর পরাবলম্বন মানেই দাসত্ব। এই মনের পরাবলম্বন বা গোলামিই আমাদেরে চির-গোলাম ক'রে রেখেছে। আমাদের তেত্রিশ কোটি লোকের তেত্রিশ কোটি দেবতা, অর্থাৎ আমাদের ভারতে তেত্রিশ কোটি মানুষের সকলেরই নির্ভরতা তাদের স্ব-স্ব দেবতার ওপর ! সবাই বলেন, দেবতা আছেন—আর তাঁরা নেই। অর্থাৎ কিনা এটা নাস্তিকের দেশ, স্ব-হীন দেশ। অতএব এ স্ব-হীন দেশ যদি বলে যে, স্বরাজ লাভ করব, তাহ'লে যে তাদেরে উপহাস করে আর ঐ নাস্তিকের বুকে লাথি মারে, সে অন্যায় করে ব'লে তো মনে হয় না—উল্টো উপকারই করে। যার অন্তরে আপন সত্য আপন ভগবান সহজে জাগে না, তাদের ভগবান এমনি করে বুকে লাথি খেয়ে তবে জাগে। যারা আমাদেরে পায়ের তলায় রেখে আমাদের বুকে পদাঘাত করছে, মুখে থুথু দিচেছ, তারা আমার নমস্য। সে অসুরের পায়ের ধুলো আমি মাথায় নিই, যে অসুর ভীরু দেবতাকে পদাঘাত ক'রে পৌরুষ শেখায়, তার লুপ্ত দেবত্বকে সিংহ-বিক্রমে জাগিয়ে তোলে। যে জাগ্রত ওস্মান সুপ্ত জগৎসিংহকে ভীম-পদাঘাতে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে আমি নমস্কার করি। যে ভৃগু নিদ্রিত ভগবানের বুকে লাথি মেরে জাগায়, সে ভৃগুকে আমি প্রণাম করি। যে নরমুণ্ড-মালিনী চণ্ডী নিদ্রিত শিবের বুকে তাণ্ডব নৃত্য করে প্রলয়-করতালি বাজিয়ে তাকে জাগিয়ে তোলে, সেই অশিব-নাশিনীর উদ্দেশে আমার কোটি কোটি নমস্কার। শিবকে জাগাও, কল্যাণকে জাগাও। আপনাকে চেনো। বিদ্রোহের মতো বিদ্রোহ যদি করতে পারো প্রলয় যদি আনতে পারো তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই, কল্যাণ আসবেই। লাথির মতো যদি লাথি মারতে পারো, তা হ'লে ভগবানও তা বুকে করে রাখে। ভৃগুর মতো বিদ্রোহী হও, ভগবানও তোমার পায়ের ধুলো নেবে। কাউকে মেনো না, কোনো ভয়ে ভীত হয়ো না বিদ্রোহী। ছুটাও অশ্ব, চালাও রথ, হানো অগ্নিবাণ, বাজাও দামামা-দুন্দুভি ! বলো, যে যায় যাক সে, আমি আছি। বলো আমিই নূতন করে জগৎ সৃষ্টি করব। স্রষ্টার আসন থরথর ক'রে কেঁপে

www.banglarblog.com

উঠুক ! বল, কারুর অধীনতা মানি না, স্বদেশীরও না, বিদেশিরও না। যে অপমান করে তার চেয়ে কাপুরুষ হীন সে-ই, যে অপমান সয়। তোমার আত্মশক্তি যদি উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে তবে বিশ্বে এত বড় দানব-শক্তি নেই যা তোমাকে পায়ের তলায় ফেলে রাখে। নির্যাতন যদি সয়ে থাকো, তবে সে দোষ তোমারি। নিজের দুর্বলতার জন্য অন্যের শক্তির নিন্দা করো না।

জাগো অচেতন, জাগো ! আত্মাকে চেনো ! যে মিথ্যুক তোমার পথে এসে দাঁড়ায়, পিষে দিয়ে যাও তাকে, দেখবে তোমারই পতাকা-তলে বিশ্ব-শির লোটাচ্ছে। তোমারি আদর্শে জগৎ অধীনতার বাঁধন কেটে উদার আকাশতলে এক পঙ্‌ক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

স্বাগত

'খোশ-আমদেদ্‌ !' স্বাগত হে দেশবন্ধু ! হে বীরেন্দ্র ! তোমাদের এই তিমির রাত্রির অবসানে আমরা আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। তোমরা ফিরে এস এই বাংলার শ্মশানে।

জ্বালিয়ে রেখেছি এই শ্মশান-চিতার হোম-শিখা ; এস ঋষি, হোতা হও। এস তবে, কপালে শ্মশান-ভস্মের পাংশু টিকা পরিয়ে দিই। দেখেছ, কি ভীষণ ধূমকুণ্ডলী উঠেছে বাংলার আকাশ-বাতাস ছেয়ে। বল ঋষি, 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান !' এস ঋত্বিক, উচ্চারণ করো শব-সাধনার মন্ত্র। এই শবের মাঝে শিব জাগাতে হবে। পারবে ? —তবে এস। এই নাও মড়া, এই ধরো নর-কঙ্কাল—স্তূপে স্তূপে সাজানো। আর কি চাও ঋষি ? ঐ দেখো শৃগাল, ঐ দেখো কুক্কুর—ঐ দেখো শকুন—মড়ার পচা মাংস নিয়ে টানাটানি খাওয়া-খাওয়ি করছিল। জ্যান্ত মানুষের সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেল। ঐ দেখো, শ্মশানে নাচছে ভূত-প্রেত-ডাকিনী-যোগিনী, —এই ভূতে-ভরা শ্মশানে এসে তোমাদেরও যেন ভূতে না পায়—সাবধান ঋষি ! তোমরা ছিলে অন্ধকারের শান্তিতে, স্নিগ্ধ কালো অন্ধকার তোমাদের মায়ের মতো কোলে করে রেখেছিল। এখন এলে শ্মশানের বিকট অট্টহাস, করুণ আর্তনাদ আর প্রলয়-নৃত্যের ভীম কোলাহলের মাঝে।

ভয় পাচ্ছ কি ঋষি ? সাবধান ! এ কাল-শ্মশানে এসে সবাই ভয় পায়, ভূত-যোনি-গ্রস্ত হয়। তাই আবার বলি, সাবধান ! এখানে ভয় বড়, বড় ক্রন্দন, বড় জ্বালা। সইতে পারবে ? এখানে মায়ের কোল নেই, পিতার মঙ্গলহস্ত নেই, ভগিনীর স্নেহ নেই, এখানে কল্যাণীর মঙ্গলদীপ জ্বলে না। কেউ পথ দেখাতে নেই। অভাব, বেদনা, আঘাত,

www.banglarblog.com

মার, বিদ্রূপের চাবুক-জ্বালা, অনাদর, অপমান, এই সপ্ত নরক হা করে আছে গ্রাস করবার জন্যে। এই জাহান্নামের মধ্যে ব'সে পুষ্পের হাসি হাসতে পারবে? —তবে এস ঋষি, এস! বন্ধনভয় রাজভয়-বিজেতা বীর তোমরা, এই শ্মশানে শবের মাঝে এসে বসো। শিব আর অন্নপূর্ণাকে এই মড়ার মুল্লুকে যদি কোনোদিন আনতে পারো, তবে সেইদিন তোমাদের নমস্কার করব। আজ তোমাদের জন্যে আমাদের নমস্কার নেই।

এই শ্মশানে আছে শুধু পিশাচের খলখল অট্টহাস, আর অসহায়ের করুণ নাড়ি-ছেঁড়া মর্মভেদী ক্রন্দন! তা নিতে চাও? —তবে নাও। কিন্তু তা সইবে না ঋষি। আবার বলি, আজ তোমাদের জন্যে গৃহের মঙ্গল-শঙ্খ নয়, —তোমাদের জন্যে স্রক্-চন্দন নয়, তোমাদের জন্যে শ্মশানের ধূম আর ভস্ম, অট্টহাস আর ক্রন্দন, রক্ত আর অশ্রু—মৃত্যু আর ভীতি! এরই মাঝে হে চিত্তরঞ্জন, হে বীরেন্দ্র! তোমাদের জন্যে ধুলায় আসন পাতা। তোমরা এস। স্বাগত![১]

BanglarBlog

'মেয়্ ভুখা হুঁ'

পাগলি মেয়ের কী খেয়াল উঠল, হঠাৎ দুপুর রাতে ডুকরে কেঁদে উঠল, 'মেয়্ ভুখা হুঁ'!

মঙ্গল-ঘট গেল ভেঙে, পুরনারীর হাতের শাঁখ আর বাজে না, শাঁখাও গেল টুটে। ভীত শিশু মাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, 'মা, ও কে কাঁদে?'

মা বললে, 'চুপ কর, ও পাগলি, ও ডুলুনি, ছেলে ধরতে এসেছে।'

পাশে ছিল দস্যি ছেলে ঘুমিয়ে। সে লাফিয়ে উঠে বললে, 'মা আমি দেখব পাগলিকে!'

মা ঠাস্ করে ছেলের গালে এক চড় কসিয়ে বললে, 'দস্যি ছেলে! কথার ছিরি দেখ, ঐ ডাইনি মাগিকে দেখবেন্! শুয়ে থাক্ গিয়ে চুপটি করে। ষাট! ষাট!'

কিন্তু ছেলে আর ঘুমায় না। তাঁর কাঁচা রক্তের পুলক-নাচা চঞ্চলতায় এক অভিনব সুর বাজতে লাগল।

'মেয়্ ভুখা হুঁ!'

সে সুর—সে ক্রন্দন কাছে—আরো—আরো কাছে এসে যেন তারই দোরের পাশ দিয়ে কেঁদে গেল অনেক দূরের পুবের পানে। সে ক্রন্দন যত দূরে যায়, দস্যি ছেলের রক্ত ততই ছায়ানটের নৃত্য হিন্দোলায় দুলতে থাকে, ভূমিকম্পের সময় সাগর-

১. দেশবন্ধু ও বীরেন্দ্র শাসমলের কারামুক্তি উপলক্ষে।

www.banglarblog.com

দোলানির মতো। ছেলে দোর খুলে সেই ভুখারিনীর কাঁদন লক্ষ্য করে ঝড়ের বেগে ছুটল। মা বার কতক ডেকে দোরে লুটিয়ে পড়ল। সে অসম্ভবকে দেখবে, সে ভয়কে জয় করবে।

এলোকেশে জীর্ণাশীর্ণা ক্ষুধাতুর মেয়ে কেঁদে চলেছে 'মেয় ভুখা হুঁ।' তার এক চোখে অশ্রু আর চোখে অগ্নি। দ্বারে দ্বারে ভুখারিনী কর হানে আর বলে, 'মেয় ভুখা হুঁ!'

বুড়োর দল নাক সিঁটকিয়ে ভাল করে তাকিয়াটা আঁকড়ে ধরে, তরুণ যারা তারা চমকে বাইরে বেরিয়ে আসে, আর মা'রা ভয়ে বুকের মানিককে বুকে চেপে ধরে।

স্ত্রী ঘুমের মাঝে স্বামীর ভুজ-বন্ধন ছাড়িয়ে হঠাৎ বাতায়ন খুলে ভেজা-গলায় শুধোয়, কে এমন করে কেঁদে যায়? এমন ঝড়-বাদলের নিশীথে স্বামী স্ত্রীকে আরো জোরে বুকে চেপে ধরে ভীত জড়িত কণ্ঠে বলে, 'আহা, যেতে দাও না—'

ভুখারিনীর পেছনে দস্যি ছেলের দলটা বেশ দল-পুরু হয়ে উঠল। তারা সেই ঝন্ঝারাতের উদাসিনীকে ঘিরে উদ্দাম চঞ্চল আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি চাও ভুখারিনী—অন্ন?'

উদাসিনী ছলছল চোখে আর এক দোরে কর হেনে কেঁদে ওঠে, 'মেয় ভুখা হুঁ।'

'অন্ন চাও না? তবে কি চাও,—বস্ত্র?' এবার কণ্ঠস্বরে আরো কান্না আরও তিক্ততা ফুটে ওঠে,—'মেয় ভূখা হুঁ!'

উদাসিনী রাজপুরীর প্রান্তে এসে পড়ল।

অধীর ক্ষিপ্ত কণ্ঠে দস্যি ছেলের দল চিৎকার করে উঠল, 'বল্ বেটি কি চাস, নইলে তোর একদিন কি আমাদের একদিন, --কি চাস তুই? আশ্রয়?

ভুখারিনী কিন্তু কথাও কয় না, ফিরেও তাকায় না। একটা একটানা বেদনা ক্রন্দন-ধ্বনি তার আর্তকণ্ঠে বারেবারে গুমরে ওঠে—'মেয় ভুখা হুঁ!'

দস্যি ছেলেগুলো এবার সত্যি সত্যিই খেপে উঠল। তাদের কৃপাণ একবার কোষমুক্ত হয়ে আবার কোষবদ্ধ হলো। এ যে নারী—মা।

কিন্তু রক্ত তাদের তখন অগ্নি-গিরি-গর্ভের বহ্নি-সিন্ধুর মতো গর্জন করে উঠেছে, তাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। আর পারে না, সব বুঝি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবার। উদাসিনী এক গভীর অরণ্যের প্রান্তে এসে ছিন্ন-কণ্ঠ কপোতিনীর মতো আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো, 'মেয় ভূখা হুঁ!'

ঝন্ঝা যেন মুখে চাবুক খেয়ে হঠাৎ থেমে গেল। বনের দোলা, নদীর ঢেউ, বৃষ্টির মাতামাতি সমস্ত তার বেদনায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। দিগন্ত-কোল থেকে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ রক্ত-আঁখি মেলে বেরিয়ে এল। বনের শ্বাপদকুল উদাসিনীর পায়ের তলায় মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ল। নিস্তব্ধ-নিঝঝুম।

সে কি অকরুণ নিস্তব্ধতা। কানের কাছে কোন্ না-শোনা সুরের অগ্নিঝঙ্কার যেন অবিরাম করাত চলার মতো শব্দ করতে লাগল—ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্-ম্।

www.banglarblog.com

সেই সুর উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে শেষে খাদের দিকে নামতে লাগল।

এইবার যেন, 'বাজে রে বাজে ডমরু বাজে—হৃদয় মাঝে, ডমরু বাজে।'

এই কি বিশ্ব ঘোরার প্রণব নিনাদ? এক সাথে তিনটা উল্কা আকাশ ফুঁড়ে ধরণীর বুকে এসে পড়ল। সে যেন খ্যাপা ভোলানাথের ছোঁড়া ত্রিশূল, অথবা তাঁরই ত্রি-নয়ন হতে ঝরে-পড়া তিন ফোঁটা অগ্নি-অশ্রু।

দুষ্ট মেয়ে গঙ্গা কলকল কলকল করে হেসে উঠে সব নিস্তব্ধতা ভেঙে দিলে। দিগ্‌চক্র-রেখায় রেখায় বনানীপুঞ্জ দুলে দুলে উঠল, সে যে উলসিত শিবের জটা চাঞ্চল্য।

পাগলি আবার কেঁদে উঠল, 'মেয়্ ভূখা হুঁ!'

দস্যি ছেলের দল এবার সত্যি সত্যিই অধৈর্য হয়ে উঠল। উদাসিনীর কেশাকর্ষণ করে উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠল, 'বল্ বেটি কি চাস?'

হরিৎ-বনের বুক চিরে বেরিয়ে এল রক্ত-কাপালিক। ভালে তার গাঢ় রক্তে আঁকা 'অলক্ষণের তিলক-রেখা।' বুকে তার পচা শবের গলিত দেহ। আকাশে খড়গ উৎক্ষিপ্ত করে কাপালিক হেঁকে উঠল, —'বেটি রক্ত চায়!'

কে যেন একটা থাবা মেরে সূর্যটাকে নিবিয়ে দিলে।

দস্যি ছেলেরা হঠাৎ তাকিয়ে দেখে কোথাও কিছু নেই। শুধু অনন্ত প্রসারিত শ্মশান, তার মাঝে পাগল বেটি ছিন্নমস্তা হয়ে আপনার রুধির আপনি পান করছে আর চ্যাঁচাচ্ছে, 'মেয়্ ভূখা হুঁ—মেয়্ ভূখা হুঁ!'

তরুণের দল ভীম হুঙ্কার করে উঠল, 'বেটি রক্ত চায়! বেটি রক্ত চায়!'

মহা উৎসব পড়ে গেল ছেলেদের মধ্যে—তারা যজ্ঞ করবে। এবার মায়ের পূজার বলি হলো মায়ের ছেলেরাই।

শ্মশান আজ নিস্তব্ধ, জগৎ-সৃষ্টির পূর্বমুহূর্তে বিশ্ব যেমন নিস্পন্দ হয়ে গেল, তেমনি স্তব্ধাহত।

* * *

রক্ত-যজ্ঞের পরের দিন কৈলাসে জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা দশহাতে করুণা, স্নেহ আর হাসি বিলাচ্ছে দেখলাম। বললুম, বেটি জগদ্ধাত্রীই বটে। কাল তার ছেলেরা বলি হয়ে বেটির ক্ষুধা মেটালে, আর আজ সে দিব্যি অন্নপূর্ণা সেজে আনন্দ বিলোচ্ছে।

একরাশ ফোটা শিউলি পুবের হাওয়ায় উড়ে এসে আমায় চুম্বন করে গেল। কেমন করুণ শান্তিতে মন যেন আবার কানায় কানায় ভরে উঠল।

ও হরি! দেখি কি, অন্নপূর্ণা বেটির ঘরের একপাশে তার ছিন্নমস্তা ভৈরবী মূর্তির মুখোশটা পড়ে রয়েছে। ভোলানাথ তো হেসেই অস্থির।

www.banglarblog.com

আরো দেখলুম কালকার রক্ত–যজ্ঞের আহুতি ঐ দস্যি ছেলের সব কটাই জলজ্যান্ত বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যে দশটা ছেলে নীলকণ্ঠ শিবের কাছে, তাদের সব কণ্ঠ নীল। সে নীল দাগ তাদের টুঁটি টিপে মারার—ফাঁসির দাগ। আর যে-দলটা অন্নপূর্ণার ভাঁড়ার ঘরের পাশে জটলা করছে, তাদের কণ্ঠে লাল দাগ ; ঘাতকের হানা খড়্গ–রক্ত প্রেয়সীর শরম–রঞ্জিত চুম্বনের মতো তাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে রয়েছে।

পথিক ! তুমি পথ হারাইয়াছ ?

'পথিক ! তুমি পথ হারাইয়াছ ?'

বনানী–কুন্তলা ষোড়শী বনের বুক চিরে বেরিয়ে এসে পথ–হারা পথিককে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'পথিক ! তুমি পথ হারাইয়াছ ?'

সেদিন দিশে–হারা পথিকের মুখে উত্তর যোগায়নি। সুন্দরের আঘাতে পথিকের মুখে কথা ফোটেনি।

পথিক সেদিন সত্যই পথ হারিয়েছিল।

হে আমার গহন–বনের তরুণ–পথিক দল ! আজ সেই বনানী–কুন্তলা ভৈরবী–সুতা আবার বনের বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে—চোখে তার অসঙ্কোচ দৃষ্টির খড়্গ–ধার, ভালে তার কাপালিকের আঁকা রক্ত–তিলক, হাতে তার অভয় তরবারি—সে আবার জিজ্ঞাসা করছে—'পথিক ! তুমি পথ হারাইয়াছ ?'

উত্তর দাও, হে আমার তরুণ পথ–যাত্রী–দল ! ওরে আমার রক্ত–যজ্ঞের পূজারী ভায়েরা ! বল্ তোরাও কি আজ সৌন্দর্যাহত রূপ–বিমূঢ় পথহারা পথিকের মতো মৌন নির্বাক চোখে ঐ ভৈরবী রূপসীর পানে চেয়ে থাকবি ? উত্তর দে মায়ের পূজার বলির নির্ভীক শিশু !

বল্ মাভৈ ! আমরা পথ হারাই না ! আমাদের পথ কখনো হারায় না। বল্ আমাদের এ–পথ চির–চেনা পথ। হাটের পথিকের পায়ে–চলার পথ আমাদের জন্য নয়। সিংহ–শার্দূল–শঙ্কিত কণ্টক–কুণ্ঠিত বিপথে আমাদের চলা। ওগো ভৈরবী মেয়ে ! এ রক্ত–পথিকের দল, নবকুমারের দল নয়। ভৈরবী রূপসী আবার জিজ্ঞাসা করে, 'পথিক ! তুমি পথ হারাইয়াছ ?'

এবার বল আমার বন্য তরুণ দল, 'ওগো, আমরা পথ হারাইয়াছি, বনের পথ হারায় নাই।'

অকুণ্ঠিতা অনবগুণ্ঠিতা বন–বালার চোখে কুণ্ঠার ছায়া–পাত হোক, পরাজয়ের লাজ–অবগুণ্ঠন পড়ুক !

www.banglarblog.com

নিবিড় অরণ্য। তারই বুকে দোলে, দোলে, মহিরুহ সব দোলে—বনস্পতি দল দোলে—লতা-পাতা সব দোলে! দোলে তারা সবুজ খুনের তেজের বেগে। তারই মাঝে চলে—চলে আমার বন-হিংস্র বীরের দল। তাদরে পথ দেখায় কাপালিকের রক্ত-তিলক পরা ভৈরবী মেয়ে।

অদূরে কাপালিকের রক্ত-পূজার মন্দির। মন্দিরে রক্ত-ভুখারিনীর তৃষ্ণাবিহ্বল জিহ্বা দিয়ে টপটপ ক'রে পড়ছে কাঁচা খুনের ঝারা। দূরে হাজার কণ্ঠের ভৈরব-গান শোনা গেল—

'তিমির হৃদয়-বিদারণ, জলদগ্নি নিদারুণ।
জয় সঙ্কট সংহর। শঙ্কর। শঙ্কর।'

রক্ত-পাগলি বেটির পায়ের চাপে শিব আর্তনাদ করে উঠল। রক্ত-মশাল করে ভৈরবপন্থীর কণ্ঠ শোনা গেল আরো কাছে—

'বজ্র-ঘোষবাণী, রুদ্র শূলপাণি,
মৃত্যু-সিন্ধু-সন্তর। শঙ্কর! শঙ্কর!'

আবার শিব মোচড় খেয়ে উঠল, কিন্তু শব তার বুকে চেপে।

মন্দির থরথর করে কাঁপতে লাগল। উলসিত বনানী ঝড়ের ফুঁ দিয়ে নাচতে লাগল।

কাপালিকের রক্ত-আঁখি দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আর দেরি নাই, ঐ আসে রক্ত-পূজার বলি। ছেড়ে দে বেটি, ছেড়ে দে শিবকে, কল্যাণকে উঠে দাঁড়াতে দে।

ইন্দ্রের বজ্রে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হতে লাগল।

মেঘ-ডম্বরুতে বোধনের বাজনা বাজতে লাগল।

বিজলি মেয়ের বজ্র-কড়া নাড়ার মতো বাইরে দস্যি মেয়ে কড়কড় করে কড়া নেড়ে হেঁকে উঠল, 'দোর খোলো, পূজা এসেছে।'

বাইরে ঝড়ের দোলার তালে তালে ভৈরবপন্থীর দল নাচতে লাগল—

'কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।'

ঝনঝন শব্দে মন্দির-দ্বার খুলে গেল। কাপালিক বেরিয়ে এল, নয়নে তার দারুণ হিংসা-বহ্নি, স্কন্ধে তার বিজয়-কৃপাণ। মন্দিরের অঙ্গনে নৃত্য চলতে লাগল—

'তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।' ভৈরবী হাঁকলে, 'আর দেরি কি?'

*　　*　　*

বনানী তেমনি দোলে—দোলে—দোলে। একটা কাৎরানি, একটা ব্যথিতার ক্রন্দনের মতো কি যেন দোলে—দোলে বনানীর পাগলামিতে।

www.banglarblog.com

কখন পূজা শেষ হয়ে গেছে। কখন ঘণ্টা বাজল, কখন বলি দেওয়া হলো, তা কেউ জানলে না। শুধু মন্দিরের শুভ্র বেদী রক্তে ভেসে গেছে। শব-পাগলি বেটির চরণ শিবের বুক থেকে শিথিল হয়ে যেন নামতে চাইছে। বেটির পায়ে একরাশ কাঁচা হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করছে, যেন সদ্য-ছিন্ন রক্ত-জবার জীবন্ত কাৎরানি।

একরাশ ছিন্ন-মুণ্ড খেপি বেটির পানে ছলছল চোখে তখনো তাকাচ্ছে।

আকাশ থেকে অগ্নিরথ নেমে এল। বলিদানের তরুণরা তাতে চড়ে যখন উর্ধ্বে—উর্ধ্বে—আরো উর্ধ্বে উঠে যেতে লাগল, তখন বন্য মেয়ে কাপালিক-কন্যারও দুই গণ্ড বেয়ে টস্‌টস্ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সে করুণ-কণ্ঠে আর একবার জিজ্ঞাসা করল,—'পথিক ! তুমি পথ হারাইয়াছ ?' তারপর শঙ্করী বেটির রক্ত-মাখা পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কাপালিকের খড়্গ আর একবার নৃত্য করে উঠল। ভৈরবী শুধু বললে, 'মা !'

এবার করালী বেটির অশ্রুহীন চোখেও অশ্রুপুঞ্জ দুলে উঠল।

ততক্ষণে অগ্নি-রথ যাত্রীদলের উত্তর ভেসে এল, 'পথ হারাই নাই দেবী ! ঐ খড়্গ-চিহ্নিত রক্ত-পথই শিব জাগাবার পথ।'

আমি সৈনিক

এখন দেশে সেই সেবকের দরকার যে-সেবক সৈনিক হতে পারবে।

সেবার ভার নেবে নারী কিংবা সেই পুরুষ যে-পুরুষের মধ্যে নারীর করুণা প্রবল। নারীর ভালোবাসা আর পুরুষের ভালোবাসা বিভিন্ন রকমের। নারীর ভালোবাসায় মমতা আর চোখের জলের করুণাই বেশি। পুরুষের ভালোবাসায় আঘাত আর বিদ্রোহই প্রধান।

দেশকে যে নারীর করুণা নিয়ে সেবা করে, সে পুরুষ নয়, হয়তো মহাপুরুষ। কিন্তু দেশ এখন চায়, মহাপুরুষ নয়। দেশ চায়, সেই পুরুষ যার ভালোবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ আছে। যে দেশকে ভালোবেসে শুধু চোখের জলই ফেলবে না, সে দরকার হলে আঘাতও করবে, প্রতিঘাতও বুক পেতে নেবে, বিদ্রোহ করবে। বিদ্রোহ করা আঘাত করার পশুত্ব বা পৈশাচিকতাকে যে অনুভূতি নিষ্ঠুরতা বলে দোষ দেয় বা সহ্য করতে পারে না, সেই অনুভূতিই হচ্ছে নারীর অনুভূতি, মানুষের ঐটুকুই হচ্ছে দেবত্ব। যারা পুরুষ হবে, যারা দেশ-সৈনিক হবে, তাদের বাইরে ঐ পশুত্বের বা অসুরত্বের বদনামটুকু সহ্য করে নিতে হবে। যে-ছেলের মনে সেবা করবার, বুকে জড়িয়ে ধরে ভালোবাসার ইচ্ছাটা জন্মগত প্রবল, তার সৈনিক না হওয়াই উচিত। দেশের দুঃখ-আর্ত-পীড়িতদের সেবার ভার এই সব ছেলেরা খুব ভালো করেই করতে পারবে। যেমন উত্তর-বঙ্গের বন্যা-

www.banglarblog.com

পীড়িতদের সেবা সাহায্য। বাংলার ত্যাগী ঋষি প্রফুল্লচন্দ্র আজ মায়ের মমতা নিয়ে দু'হাতে অন্নবস্ত্র বিলোচ্ছেন, এরূপ জগদ্ধাত্রীর, এরূপ অন্নপূর্ণার, এরূপ এ মূর্তি তো রুদ্রের নয়, প্রলয়ের দেবতার চোখে এমন মায়ের করুণা ক্ষরে না। এই যে হাজার হাজার ছেলেরা এই আর্তদের সেবার জন্য দু'বাহু বাড়িয়ে ছুটেছে, এ-ছোটা যে মায়ের ছোটা, এ-করুণা, এ-সেবা-প্রবণতা নারীর, দেবতার। আমরা এঁদের পূজা করি, কিন্তু এতে তো দেশের বাইরের মুক্তি স্বাধীনতা আনবে না। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, প্রফুল্ল বাংলার দেবতা, তাঁদের পূজার জন্য বাংলার চোখের জল চির-নিবেদিত থাকবে। কিন্তু সেনাপতি কই? সৈনিক কোথায়? কোথায় আঘাতের দেবতা, প্রলয়ের মহারুদ্র? সে-পুরুষ এসেছিল বিবেকানন্দ, সে-সেনাপতির পৌরুষ হুঙ্কার গর্জে উঠেছিল বিবেকানন্দের কণ্ঠে।

ওরে আমার ভারতের সেরা, আগুন খেলার সোনার বাংলা! কোথায় কোন্ অগ্নিগিরির তলে তোর বুকের অগ্নি-সিন্ধু নিস্তব্ধ নিস্পন্দ হয়ে পড়ল? কোন্ অলস-করা করুণার দেবতার বাঁশির সুরে সুরে তোর উত্তাল অগ্নি-তরঙ্গ-মালা স্তব্ধ-নিথর হয়ে পড়ল? কোথায় ভীমের জন্মদাতা পবন? ফুঁ দাও, ফুঁ দাও এই নিবন্ত অগ্নি-সিন্ধুতে, আবার এর তরঙ্গে তরঙ্গে নিযুত নাগ-নাগিনীর নাগ-হিন্দোলা উলসিয়া উঠুক। ওগো করুণার দেবতা, প্রেমের বিধাতা, বাঁশির রাজা। তোমরা মুক্ত বিশ্বের, তোমরা এ ঘুমন্ত দাস—অলস ভারতের নও। এই অলস জাতিকে তোমাদের সুরের অশ্রুতে আরো অলস-উতল করে তুলো না। তোমাদের সুরের কান্নায় কান্নায় এদের অলস আর্ত আত্মা আরো কাতর, আরো ঘুম-আর্দ্র হয়ে উঠল যে, এ সুর তোমাদের থামাও। আঘাত আনো, হিংসা আনো, যুদ্ধ আনো, এদেরে এবার জাগাও, কান্না-কাতর আত্মাকে আর কাঁদিয়ো না। আমরা যে আশা করে আছি, কখন সে মহা-সেনাপতি আসবে যার ইঙ্গিতে আমাদের মতো শত কোটি সৈনিক বহ্নি-মুখ পতঙ্গের মতো তার ছত্রতলে গিয়ে 'হাজির হাজির' ব'লে হাজির হবে। হে আমার অজানা প্রলয়ঙ্কর মহা-সেনানী, তোমায় আমি দেখি নাই, কিন্তু তোমার আদেশ আমি শুনেছি, আমি শুনেছি। আমায় যুদ্ধ-ঘোষণার যে তূর্য-বাদনের ভার দিয়েছ, সে ভার আমি মাথা পেতে নিয়েছি। এ যে তোমার হুকুম। সাধ্য কি, আমি তার অমান্য করি? হে আমার অনাগত অব্যক্ত মহা-শক্তি! বাজাও, বাজাও, এমনি করে আমার কণ্ঠে তোমার প্রলয়-শিঙ্গা বাজাও! তোমার রণ-ভেরী আমারই ক্ষীণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠুক। ঘরের পরের সকল মার, সকল আঘাত যেন নির্বিকার চিত্তে, হাসিমুখে সহ্য করে আমি তোমারই দেওয়া তূর্যে যুদ্ধ-ঘোষণা করতে পারি। হে আমার অপ্রকাশ মহাবিদ্রোহী, তুমিই আমায় বল দিয়ো। যেদিন তুমি আসবে সেদিন যেন তোমারই পতাকা-তলে তোমার দেওয়া তরবারিকে, রক্ত-সৈনিক বেশে দাঁড়াতে পারি। সেদিন কলিজার শোণিত-মাখা তরবারি তোমার পদতলে অর্ঘ্য দিয়ে যেন তোমার রক্ত-আঁখির প্রসাদ-চাওয়ায় বঞ্চিত না হই। যখন দুশমনের বর্শা-ফলক আমার বুকে বিদ্ধ হয়ে আমায় সৈনিকের গৌরব-দীপ্ত মরণের অধিকারী করবে যখন আমার রক্ত-হীন দেহ ধুলায় লুটিয়ে পড়বে সেদিন তুমি বলো প্রভু, 'বৎস! তুমি আমার কর্তব্য করেছ।' মনে

www.banglarblog.com

করি, হয়তো এ তূর্য-বাদনের শক্তি আমার নাই, কিন্তু ছাড়তে তো পারি না, তোমার অব্যক্ত-শক্তি, আমায় ছাড়তেও দেয় না, পিছুতেও দেয় না। সে ক্রমেই অগ্রে, আরো অগ্রে, ঠেলে নিয়ে যায়। আমার অসম্পূর্ণতা আমার অপ্রকাশ যা তোমার চোখে ক্ষমার, তা যে অন্যের চক্ষে অপরাধের প্রভু। আমার বিদ্রোহের মাঝে যেটুকু অহঙ্কার, শুধু সেইটুকু আমার হোক, তুমি শুধু বলো—আমার কণ্ঠে এসে বলো—'এ বিদ্রোহ আমার।'

ঐ অহঙ্কারের দুর্নামটুকু আমি মাথা পেতে নিতে পারি, সেই শক্তি আমায় দাও। আমার মাঝে বিদ্রোহী বেশে যখন এলে, হে আমার অনাগত মহাবিদ্রোহী বিপুল শক্তি, তখন তো বুঝিনি যে আমায় শুধু বাইরের আঘাত, ঘরের মারটুকুর অধিকারী করে নিলে, তখন তো বুঝিনি যে, এই বিদ্রোহের প্রসাদ, এর কল্যাণ-ক্ষীরটুকু তোমার। আজ শুধু ডাকছি আর ডাকছি, আমায় এবার তোমার যুদ্ধ পতাকা-তলে ডেকে নাও, মরণের মাঝে ডেকে নাও। আমায়-দেওয়া তোমার তূর্য-কেতন অন্য সৈনিককে দাও।

সেবার মাঝে আমায় সাড়া দিবার অধিকারী করলে না। বললে,—

'আর্তের অশ্রুমোচন আমার নয়, আমার রণ-তূর্য। আমি প্রলয়ের, আমি প্রেমের নই। আমি রুদ্রের, আমি করুণার নই। আমি সেবার নই, আমি যুদ্ধের। আমি সেবক নই, আমি সৈনিক। আমি পূজার নই। আমি ঘৃণার। আমি অবহেলার, আমি অপমানের। আমি দেবতা নই, আমি হিংস্র, বন্য, পশু। আমি সুন্দর নই, আমি বীভৎস। আমি বুকে নিতে পারি না, আমি আঘাত করি। আমি মঙ্গলের নয়, আমি মৃত্যুর। আমি হাসির নয়, আমি অভিশাপের।' হে আমার মাঝের তিক্ত শক্তি, রুদ্র-জ্বালা, বিষ-দাহন। হে আমার যুগে-যুগে নির্মম নিষ্ঠুর সৈনিক-আত্মা, তোমায় আমি যেন প্রশংসার লোভে খাটো না করি। তোমাকে দেবতা বলে প্রকাশ করবার ভণ্ডামি যেন কোনোদিন আমার মাঝে না আসে। আমি নিজে যতটুকু, ঠিক ততটুকুই যেন প্রকাশ করি। যুগে-যুগে পশু-আমার সৈনিক-আমার জয় হউক!!

www.banglarblog.com